উত্তর বাংলায় লাক্ষা চাষের সোনালি দিনের প্রত্যাবর্তন

Returning Golden time of Lacca Cultivation in the Northern region of Bangladesh

ড. পরেশ কুমার শর্মা

Abstract

The study describes the status of lac cultivation and its economic return in the Northern region of Bangladesh. The number of families involved in lac growing activities decreased with time. Lac, popularly known as shellac, in its refined flake form, is the resinous substances secreted as a protective covering by a tiny lac insect, *Laccifer lacca,* which is found as a parasite on a number of both wild and cultivated plants. It has outstanding properties and exceptional versatility that is unusual to any synthetic resin due to its unique combination of chemical, mechanical, thermal and electrical properties. Lac insects can be cultured over a fairly wide range of the tropics and sub-tropics and on a large number of host trees. About 70% lac of the world is produced in India and they capture the highest position in the production and export of raw lac and lac products at the world market. Thailand is the second largest lac exporter after India with about 35% of the world market. Revised has been cultivated in about three hundred hectares of land annually in Bangladesh from which is able to provide 180 tons of crude lac. Though statistics are quite unreliable, it has been reported that currently national production of lacis around 700 tonnes per year while the demand is estimated of about 15 times of that quantity. However, trade in resin continued to expand as shellac began to find many new uses in the rapidly industrializing west - in making of varnish, stiffening of hats, grinding wheels and for insulation in electrical industry. To conclude, it may be pointed out that although exports of shellac and other lac based products contribute to our exports in a meagre way, efforts through Research and Development should be made vigorously and uninterruptedly to augment supply of value-added shellac and lac based products. Competitiveness and cost effectiveness in the context of added thrust on environment–friendly products and fierce competition in the liberal market economy are the last words for sustainability. Efforts may also be undertaken to diversify the export base of other lac products- apart from giving emphasis on shellac exports and suitable steps for awareness of cultivators, collector and efficient marketing may also be taken for dewaxed and decoloured lac and seedlac since a rising trend is noticeable in recent years in such lac based products. With regard to access to international markets, declared in Govt. policy, should encourage the entrepreneurs and merchant exporters to participate in BSMs, trade fairs, exhibitions in countries like U.S.A., Germany, Egypt, Italy, U.A.E. Spain and Indonesia which are the prominent buyers of lac products.

ভূমিকা ঃ

লাক্ষার সাথে আমরা কমবেশী অনেকেই পরিচিত। লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা, ক্যারিয়া লাক্ষা কর্তৃক নিঃসৃত রঞ্জক জাতীয় পদার্থ। এটা প্রাণিজাত বহুমুখী-গুণ সম্পন্ন এক প্রকার রঞ্জক যার অনুপম গুণাগুণের কারণে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষা পোকার ত্বকের নিচে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক প্রকার গ্রন্থি থেকে আঠালো রস নিঃসৃত হয়, যা ক্রমশ শক্ত ও পুরু হয়ে পোষক গাছের ডালকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পোষক গাছের ডালের এই আবরণই 'লাক্ষা বা লাহা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ডালের উক্ত শক্ত আবরণ ছাড়িয়ে ও শোধিত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্যাবহারিক দিক থেকে লাক্ষা মানুষের জীবনে অতি প্রয়োজনীয় একটি অর্থনৈতিক সম্পদ।

উর্দ্ধোতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (স্পেশাল গ্রেড), বাউরেস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২, মোবাইল : ০১৭১২০৫২৩৮৫

পৃথিবী ব্যাপী মানুষের দৈনন্দিন নানাবিধ চাহিদা মেটাতে অত্যান্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ন সহায়ক এবং মূল্যবান সম্পদের ভূমিকা পালন করে আসছে লাক্ষা। ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে অগ্রগতির দিক থেকে লাক্ষা চাষ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোনালী দিন আবার ফিওে এসেছে। পৃথিবীতে আদিকাল থেকেই নানা কাজে লাক্ষার ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। পৌরানিক যুগেও বঙ্গ-ভারতসহ এ উপমহাদেশে লাক্ষা বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা হতো। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মহাভারতে আদিপর্বে, "কৌরবগণ পান্ডবদের ধ্বংস করার জন্য লাক্ষা দিয়ে 'জতুগৃহ' তৈরী করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। ১৫৯০ খৃঃ সম্রাট আকবর লিখিত 'আইন-ই-আকবরী' বইতে লাক্ষার ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম সাধু পুরুষ আবু হানিফা (রাঃ) লিখিত বইতেও লাক্ষার নানাবিধ ব্যাবহারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

লাক্ষা পরিচিতি ও আদিকথা

লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা Lacca-Insect (লাক্ষা পোকা) বৈজ্ঞানিক নাম Laccifer-Cacca। ক্যারিয়া লাক্ষা কতৃক নিঃসৃত রজন জাতীয় পদার্থ। এ পদার্থ হাতে পরিমার্জিত রুপই হলো লাক্ষা। চীন দেশে চতুর্থ শতাব্দী হতে লাক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। জাপান, থাইল্যান্ডে অষ্টম শতাব্দী হতে লাক্ষার ব্যবহারের প্রচলন হতে থাকে। লাক্ষা জাপানে 'সি-কো' এবং চীনে 'জু-ফুং' নামে পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে ভারতবর্ষে লাক্ষা চাষের উল্লেখ রয়েছে। পুরাকালে পলাশ গাছে চাষ করা হতো বলে পলাশ গাছকে 'লাক্ষারু' বলা হতো। কারণ একটাই পলাশ বৃক্ষে অসংখ্য পোকা দ্রুত পুষ্টি লাভ করত। সেই সময়ের 'মুণিঋষিগণ' পলাশ গাছের (লাক্ষাতরু) ডাল কাটা নিষেধ করতেন। মহাভারতেও এই বিষয়ে বিষদ বলা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দশকে লাক্ষা চাষের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এই উপমহাদেশের প্রথম গবেষণা কেন্দ্র, যার নাম লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র। এ ছাড়াও আসাম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যাসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে লাক্ষা চাষ করা হতো। দেশ বিভাগের পর লাক্ষা উৎপাদনকারী সিংহভাগ অঞ্চল চলে যায় ভারতে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কিছু অংশে এখনও লাক্ষা চাষ করা হয়। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অধীনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে চার একর জমির উপর দেশের একমাত্র লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এ কেন্দ্রে রয়েছে লাক্ষা চাষের জন্য প্রায় ২৫০টি পোষক গাছ অর্থাৎ ১৪০টি ৩০ বছর বয়সী কুলগাছ, ৬০টি নিমগাছ, ২৫টি কুসুম গাছ, ৮০ বছর বয়সী পাঁচটি কড়ই গাছ, ২টি পাকুড় গাছসহ আরও বেশ কিছু পোষক গাছ রয়েছে।

লাক্ষার চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে লাক্ষা চাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। সাধারণত লাক্ষা চাষের জন্য পৃথক কোনো জমির প্রয়োজন পড়ে না। লাক্ষার পোষক গাছগুলো জমির আইল, বসতবাড়ির আশপাশে, খালের পাড়, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে পরিত্যক্ত স্থানে লাগানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে লাক্ষার চাষ হয়, সেখান হতে মাত্র ২৫০ টনের মতো ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশেই এর চাহিদা রয়েছে প্রায় ১৫০০ টনের অধিক। এ ছাড়াও লাক্ষার বহুবিধ ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই লাক্ষা রপ্তানির সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ও কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশের কাজে ব্যাপকভাবে লাক্ষার ব্যবহার হওয়ায় উক্ত দেশগুলোতে একটি বড় ধরনের লাক্ষার বাজার রয়েছে। কেননা শীতপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে ওইসব দেশে লাক্ষা চাষ সম্ভবপর নয়। মোটামুটিভাবে সমগ্র বাংলাদেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী।

এ ছাড়াও অসংখ্য লাক্ষার পোষক গাছ অযত্নে অবহেলায় যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উক্ত গাছগুলোকে লাক্ষা চাষের আওতায় এনে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদনসহ বিশাল কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব। কেবলমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বর্তমানে লাক্ষার যে পোষক গাছ রয়েছে সেখান হতেই প্রায় ৪০০ টন ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদন করা সম্ভব, যা বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ৩ কোটি টাকার মতো এবং এর সাথে প্রায় ২০ হাজার ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষকের কর্মসংস্থান করাও সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ভারত একচেটিয়াভাবে লাক্ষার উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে রেখেছে। পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ লাক্ষাই ভারতে উৎপাদিত হয়।

ভারতের পশ্চিম বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম প্রদেশই বেশির ভাগ লাক্ষা উৎপাদন করে। ভারতের পরেই লাক্ষা উৎপাদনে থাইল্যান্ডের স্থান। লাক্ষার আন্তর্জাতিক বাজারে থাইল্যান্ড ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দী।

এ ছাড়াও সমগ্র বার্মায়, দক্ষিণ, চীনে, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে লাক্ষা চাষ করা হয়। তাইওয়ানের কিছু অঞ্চলে অল্প পরিমাণে লাক্ষার চাষ হয়। লাক্ষার আন্তর্জাতিক চাহিদা লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি দেশ নতুনভাবে লাক্ষা উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে এর মধ্যে ভিয়েতনাম অন্যতম।

লাক্ষার ব্যবহার সমূহ

বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এ যুগেও আধুনিক বিশ্বে নানাবিধ কাজে লাক্ষার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এর ব্যবহারের গুরুত্বের দিকটি ব্যাপক জনগোষ্ঠির নজরে না এলেও বিজ্ঞানের কৃতকৌশলের সুবিধাভোগী মানুষদের জন্য লাক্ষা নামক সম্পদ পর্দার অন্তরালে থেকে জীবন দিয়ে প্রতিনিয়ত মানুষকে সেবাদান করে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কোটি কোটি জীব, অনুজীবসহ অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় একে অপরের পরিপূরক হিসেবে জীবনসাধন করলেও পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্রাকার পোকা লাক্ষার পরিচয় শিল্প পোকা হিসেবে। পোকা বলতে অনেকের কাছে বিরক্তিকর কিছু। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকারাও যে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপকরণ হতে পারে এটি কখনও মানুষ গভীরভাবে তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে এখনও বিবেচনা করেনা। পৃথিবীতে হাজারো কীটপতঙ্গ আছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবন রক্ষার কাজে তারা অনুসর্গ হিসেবে কাজ করছে। অথচ পৃথিবীর সকল জীবের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী মানুষের কাছে সৃষ্টিজগতের এমন অনেক রহস্য এখনও অজানা রয়েছে। লাক্ষার আছে বহুবিধ ব্যবহার।

নিম্নে লাক্ষার কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- ❑ কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশ করা, বিভিন্ন ধরনের বার্নিশ, পেইন্ট ইত্যাদি তৈরি ও পিতল বার্নিশ করার কাজে।
- ❑ অস্ত্র কারখানায়, রেলওয়ে কারখানায়।
- ❑ বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানায় বার্নিশ পদার্থ হিসেবে।
- ❑ বিভিন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে আঠালো, বন্ধনকারী পদার্থ হিসেবে।
- ❑ চামড়া রঙ করার কাজে।
- ❑ ফাঁপা অংশ পূরণে।
- ❑ লবণাক্ত পানি হতে জাহাজের তলদেশ রক্ষা করার কাজে বার্নিশ হিসেবে।
- ❑ লাক্ষার উপাদান, আইসো এমব্রিটেলিডি পারফিউম শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- ❑ লাক্ষা হতে নির্গত আরেকটি উপাদান অ্যালুরিটিক এসিড পারফিউম শিল্পে, পোকার যৌন আকৃষ্টকরণ পদার্থ তৈরিতে এবং অনেক ওষুধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

KRISHI PROJUKTI BARTA

❑ লাক্ষার আবরণমুক্ত কাঠ অত্যন্ত উঁচু মানে জ্বালানী রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
❑ ডাকঘরের চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি সীলমোহর করার কাজে।
❑ পুতুল, খেলনা, আলতা, নখরঞ্জন, শুকনা-মাউন্টিং টিস্যু পেপার ইত্যাদি তৈরির কাজে।

লাক্ষার চাষ প্রনালী ও উৎপাদন কৌশল

লাক্ষার চাষের উপযোগী আবহাওয়া

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী। যেসব অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম ও শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা নয় এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেমি. থেকে ১২৫ সেমি. পর্যন্ত হয়, সেসব অঞ্চলে লাক্ষার চাষের জন্য উপযোগী। গ্রীষ্মকালে যদি তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সে. এবং শীতকালে ১৫ ডিগ্রি সে. এর নিচে নেমে যায় তবে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়, যদিও লাক্ষা নিঃসরণ বন্ধ হয় না।

লাক্ষা কীটের পোষক গাছ

যেসব প্রজাতির গাছে লাক্ষা ভালো জন্মায় সেগুলোকে লাক্ষার পোষক গাছ বলে। যদিও প্রায় ১০০ প্রজাতির গাছে লাক্ষা জন্মাতে পারে তবুও মাত্র কিছু প্রজাতিতে লাক্ষার পোকা ভালোভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশে কুল, শিরিষ, বট, পাকুড়, পলাশ, খয়ের, বাবলা, ডুমুর, অড়হর, কুসুম প্রভৃতি গাছে লাক্ষা ভালো জন্মে।

লাক্ষা উৎপাদনের মৌসুম

দুই ধরনের লাক্ষা পোকা লাক্ষা উৎপাদনের সাথে জড়িত। বরই, পলাশ, বাবলা ইত্যাদি পোষক গাছসমূহে যে সমস্ত পোকা লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং লাল বলে এদের রঙ্গিনী পোকা বলে। অন্য আর এক ধরনের লাক্ষা কীট কেবলমাত্র কুসুমগাছে ভালভাবে বৃদ্ধি লাভ ও বংশ বিস্তার করতে পারে এবং যে লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং হলদে বা কুসুমী বলে এরা কুসুমী লাক্ষা নামে পরিচিত। প্রতি বছর প্রত্যেক প্রকারের লাক্ষা পোকা দুইবার ফসল দিতে পারে। রঙ্গিনী পোকার ক্ষেত্রে- কার্তিকী ফসল 'অক্টোবর-নভেম্বর' মাস (ফসল সংগ্রহের সময়)। বীজ লাক্ষা লাগানোর সময় জুন-জুলাই (আষাঢ়) মাস। বৈশাখী ফসল-'এপ্রিল-মে (ফসল সংগ্রহের সময়)। বীজ লাক্ষা লাগানোর সময়- অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক) মাস। আবার কুসুমী লাক্ষা পোকার ক্ষেত্রেঃ- অগ্রহণী ফসল- ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস (ফসল সংগ্রহের নময়)। বীজ লাক্ষা লাগানোর সময় জুন-জুলাই (আষাঢ়) মাস। জেঠুই ফসল- জুন-জুলাই (ফসল সংগ্রহের সময়)। বীজ লাক্ষা লাগানোর সময় জানুয়ারী-ফেরুয়ারী (মাঘ) মাস। এভাবে বাংলাদেশে বছরে মোট ৪টি লাক্ষা ফসল পাওয়া সম্ভব।

লাক্ষা চাষের উপযোগি এলাকা

শীতপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে ইউরোপ আমেরিকার মত দেশেগুলোতে লাক্ষাচাষ সম্ভব নয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগি। যে সকল অঞ্চলে গ্রীষ্ণকালে অত্যন্ত গরম ও শীতকালে অত্যধিক ঠান্ডা নয় এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হয়, সে সকল অঞ্চলে লাক্ষার চাষ ভালো হয়।

কিন্তু বর্তমানে এসব এলাকায় একাধিক আম বাগান গড়ে ওঠার কারণে মৌসুমজুড়ে বা মৌসুমের বাইরেও পোকামাকড় দমনে স্প্রে করার কারণে লাক্ষার কীট মরতে শুরু করে। সেই কারণেই লাক্ষার চাষ সরিয়ে বরেন্দ্রের নাচোলে আনা হয়েছে। এই অঞ্চলে আমের বাগান না থাকার কারণে পোকামাকড় দমনে স্প্রে করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে লাক্ষা কীট চাষেও সৃষ্টি হয় না কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। এছাড়াও লাক্ষা চাষ বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা বরইগাছে করার কারণে প্রতি গাছে লাভ হচ্ছে কয়েক হাজার টাকা। আবার বরই বিক্রি করেও লাভবান হয়ে থাকে মালিকরা। ফলে এই অঞ্চলের মহিলারা ঝুঁকছে লাক্ষা চাষে। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই বীচি পড়ে বরই গাছ জন্মে থাকে। প্রয়োজন পড়ে না গাছের তত্ত্বাবধানে সার প্রয়োগ কিংবা সেচের। তাই লাক্ষা চাষে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের (বরেন্দ্র) মানুষ।

পোষক গাছ ছাঁটাইকরণ

লাক্ষার কীটগুলো কেবল গাছের কচি ডগা বা ডাল হতে রস শোষণ করতে পারে। সেজন্য যে পোষক গাছে লাক্ষাকীট সংক্রমণ করা হবে তা আগেই ছাঁটাই করা উচিত। কার্তিকী ফসলের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি এবং বৈশাখী ফসলের জন্য মধ্য এপ্রিল গাছ ছাঁটাইয়ের উপযুক্ত সময়।

শিশু কীট সংক্রমণ

ভালো লাক্ষার ফলন কীট সংক্রমণের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সে কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে:

১) যতদূর সম্ভব স্ব-সংক্রমণ এড়িয়ে চলা অত্যাবশ্যক।
২) শত্রু কীটমুক্ত, পরিপক্ক ও বীজ লাক্ষা ব্যবহার করা উচিত।
৩) বীজ লাক্ষার গাছ হতে কাটার পর পরই সংক্রমণ করা উচিত।
৪) সংক্রমণের জন্য সঠিক পরিমাণ বীজ লাক্ষা ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত একটি পরিপক্ক বীজলাক্ষার টুকরা নিজস্ব দৈর্ঘ্যের প্রায় ১৫-২০ গুণ পরিমাণ অধিক স্থান সংক্রমণ করতে পারে।
৫) বীজলাক্ষা সমেত টুকরাটি এমনভাবে পোষক গাছের ডালে বাঁধতে হবে যেন সেটা গাছের ডালের সাথে বেশ ভালোভাবে লেগে থাকে। বীজ লাক্ষা টুকরাগুলো কচি ডালের যত কাছাকাছি বাঁধা যায় ততই ভালো।
৬) বীজলাক্ষার লাগানোর পর শিশু কীটগুলো পোষক গাছের কচি ডালের সমসত্ম স্থানে বসে গেলে যত শিঘ্রই সম্ভব বীজ লাক্ষা টুকরাগুলো সরিয়ে নেয়া উচিত।

ফসল কাটা

লাক্ষার সমপূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পরই ফসল কাটা উচিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে ফসল পরিপক্ক হওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব :

১) স্ত্রী কোষগুলোর ভেতরের পদার্থেও দানাবদ্ধ ভাবে থাকে। যদি একটি স্ত্রী কোষ দুটি আঙুলের সাহায্যে পিষে দেয়া যায় তাহলে বৈশাখী ও কার্তিকী উভয় ফসলেই ৩-৪ সপ্তাহ পূর্ব হতেই ভেতরের পদার্থের একটি দানা দানাভাব লক্ষ্য করা যায়।
২) লাক্ষার আবরণে ফাটল ধরা বৈশাখী ও কার্তিকী উভয় ফসল পরিপক্কতা লাভের ২-৩ সপ্তাহ আগে লাক্ষার আবরণে একটি ফাটা দাগ লক্ষ্য করা যায়।

৩) লাক্ষার ফসলের আবরণের শুষ্কাভাব শিশু কীটের ঝাঁক বেঁধে বের হওয়ার প্রায় ২ সপ্তাহ আগ থেকেই লাক্ষার আবরণ শুষ্ক হয়েছে বলে মনে হয়।

৪) স্ত্রী কোষের পেছনের অংশ হলুদবর্ণ ধারণ করে। স্ত্রী কোষের পেছনের দিকে ৩টি ছিদ্র থাকে। একেবারে নিচের দিকের ২টি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্য এবং অন্যটি একটু উঁচুতে। উক্ত ছিদ্রটি হতে একগুচ্ছ সাদা আঁশ বের হতে দেখা যায়। ঐ ছিদ্রের কাছে কোষের রঙ কমলা রঙের থাকে। কিন্তু শিশু কীট বের হওয়ার আগে উক্ত কমলা রঙ পরিবর্তিত হয়ে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে ।

সাধারণত লাক্ষার ফসল দু'ভাবে উত্তোলন করা যায়। যদি সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই তা কাটা হয় অর্থাৎ ঝাঁক বেঁধে শিশুকীট বের হওয়ার আগেই কাটা হয়ে থাকে তাতে জীবন্ত কীট থাকে তখন তাকে বলা হয় 'আরি'। অন্যদিকে শিশুকীট বের হয়ে যাওয়ার পর তা কাটা হলে তাতে কেবল মৃত পোকাই থাকে তখন ঐ লাক্ষারকে 'ফুংকি' বলে। লাক্ষার ফসল যদি 'আরি' অবস্থায় কাটা হয়, তা হলে তাতে জমাট বাঁধার সম্ভাবনা 'ফুংকি' লাক্ষার অপেক্ষা বেশি থাকে। লাক্ষা ফসল 'আরি' হিসেবে সংগ্রহ করলে বীজ লাক্ষার অপ্রতুলতা দেখা দেয়। পোষক ডাল হতে পরিপক্ক লাক্ষা দা বা কাঁচির সাহায্যে ছাড়ানো হয়। ছাড়ানো লাক্ষার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গুদামজাত করা বা প্রক্রিয়াজাতকরণ করা উচিত।

bleached করা যায়, যা রঙ সাদা হয়। চাবুক ল্যাকের ঔষধের ট্যাবলেট, কনভেনিয়েন্স ইত্যাদি লেপের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

ভারত বিশ্বব্যাপী প্রধান লাক্ষা উৎপাদনকারী দেশ, প্রায় ১৮,০০০ মেট্রিক টন কাঁচা লাক্ষা উৎপাদন করে। দেশের প্রায় ৮৫% উৎপাদন বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জার্মানি এবং মিশর বিশ্বের কিছু ল্যাক আমদানিকারী দেশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে শূকর, পাতা প্রভৃতির মতো বড় অলঙ্ঘনের জন্য পেষণকারী এবং হাতকোখর দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। দুটি ঔষধ, ইখখার (সিম্বোপোগন সির্টেরটস) এর শিকড় এবং রেওয়াড চিনির (রুহম ইম্পিডি) শিকড়গুলি অর্ধেক লম্বা লম্বা হয়। ইউনানী সাহিত্যে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের কুষ্ঠ প্রস্তুত করা হয় i.e. অনুপাত ১:১৬ তে ওষুধ ও পানি গ্রহণ করে এবং এটি উষ্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটি ভলিউম এক প্রস্থে কমায়। ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্বারা ছিদ্র করা হয় এবং শীতল করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টার জন্য এই দোআঁধে একটি মর্টারের মধ্যে ল্যাক ট্রিটুরেট করা হয় এবং তারপর মসলা কাপড় দ্বারা sieved। Lac যে অবিলম্বন করা হয়েছিল তা ততটা প্রস্তুত করা ডেকোশনের সাথে ট্রাইট্রিশনের অধীনে ছিল। পুরো ল্যাক ফিল্টার করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। ডিপ্রেশন তখন ফ্রিজে পুরো রাতে দাঁড়িয়ে থাকে। তলদেশে পললযুক্ত লাক্ষ তদনুযায়ী তুষারপাতের ডেকোকেশন দ্বারা পৃথক করা হয়। প্রাপ্ত ল্যাক ট্রে এবং ছায়া শুকানো মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

লাক্ষার প্রক্রিয়াকরণ ঃ

লক encrustations স্ক্রাপিং দ্বারা হোস্ট উদ্ভিদ twigs থেকে সরানো হয়। কাঁচা ল্যাক এইভাবে চিহ্নিত করা হয় ল্যাক বা লাঠি লাঠি। Sticklac ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের সঙ্গে ধুয়ে এবং শুকানো হয়। এই আধা-সংশোধিত পণ্য, বীজ ল্যাক বা শস্যকণা বা howrie বলা হয়, যা গরম গলনাঙ্ক, পরিস্রাবণ এবং পাতলা শীট মধ্যে stretching যা পরবর্তীকালে ভঙ্গুরর ফ্লেক মধ্যে বিভক্ত শেলাক নামক একটি সিস্টেম দ্বারা আরো পরিমার্জিত হয়।

যদি কোনও দ্রাবক প্রক্রিয়াটি কাঁচামালকে শুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, ডি-ওয়াজেড, ডিসোলোওরিয়েজড ল্যাকটি শেষ পণ্য হিসেবে পাওয়া যাবে। সাধারণত রঙিন রজন এছাড়াও bleached ল্যাক প্রাপ্ত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট সঙ্গে

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ ল্যাক টিং এবং অন্যান্য বহিরাগত বিষয় জন্য হাত বাছাই হয়। এটি চূর্ণ এবং জারওয়ান্দ (অ্যারিস্টোলোকিয়া লাঙ্গা) এবং ইখখারের মূল জলের জলের সাথে উচিয়ে। এখানে এই পদ্ধতিতে, এই দুটি ওষুধগুলি ১:২ প্রতি লাক্ষায় প্রতি অনুপাতে নেওয়া হয় এবং এই দুটি ঔষধের উপরে (দ্বিতীয়) পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এখন প্রায় ৬-৮ ঘণ্টার জন্য মর্টারের মধ্যে তৈরি ডিপ্রোচনের সাথে সুন্দরভাবে ট্র্যাক্টর করা হয়। তারপর মসলিন কাপড় এবং lac দ্বারা sieved যে unfiltered রয়েছে উপরে আপোষিত decoction সঙ্গে trituration যাও অধীন ছিল। এবং ফিল্টারেড ল্যাক সংগ্রহ করা হয় ল্যাকের সাথে ডিপ্রেশন করে পুরো রাতে ফ্রিজে দাঁড়ানো। পুরো ল্যাক ফিল্টার করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে।

বিপণনঃ

ডাল থেকে ছাড়ানো কাঁচা লাক্ষা ভালোভাবে পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে দানা লাক্ষা তৈরি করা হয়। এই দানা লাক্ষাকে কাপড়ের তৈরি পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে তাপ দিয়ে বানানো হয় টিকিয়া। এ টিকিয়া বিক্রি হয় বাজারে। কাঁচা লাক্ষা থেকে টিকিয়া প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা রয়েছে রাজশাহী ও নাচোলে। কারখানার মালিকেরা চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা লাক্ষা কিনে নেন।

রাজশাহী অঞ্চলে লাক্ষা চাষের অপার সম্ভাবনা

দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩০০, হেক্টর জমিতে লাক্ষা চাষ হচ্ছে। সেখান থেকে মাত্র ১৮০ টনের মতো ছড়ানো লাক্ষা উৎপাদিত হয়। অথচ দেশে বছরে এর চাহিদা রয়েছে প্রায় ১ হাজার ২০০, টনের বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী। লাক্ষা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল হিসেবে চাষ হচ্ছে। লাক্ষার বহুবিধ ব্যবহারের কারণে এর চাহিদা আন্তর্জাতিকভাবে বেড়েই চলেছে। লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা Kerria Lacca কর্তৃক নিঃসৃত রঞ্জনজাতীয় পদার্থ।

বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় অর্থনৈতিকভাবে লাক্ষা উৎপাদনকারী কুটিরশিল্পগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, কাঁচামাল সরবরাহ, দারিদ্র্যবিমোচন বিকল্প কর্ম-সংস্থান বাড়াতে ২০০৮ সাল থেকে কাজ করছে সামাজিক বন বিভাগ। বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ জেলায় লাক্ষা প্রদর্শনী প্লটসহ ১ লাখ ১৬ হাজার ৫০০টি লাক্ষা পোষক গাছের বাগান তৈরি করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরীর মতিহারে বাংলাদেশ বেতারের রিলে স্টেশন এলাকায় ২০১৩-১৪ আর্থিক সালে রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের উদ্যোগে গড়ে তোলা বাগানে ৪ হাজার লাক্ষা পোষক কুলগাছ রয়েছে। এ বাগানের ২১ জন উপকারভোগী কার্তিকী ফসলের জন্য ফেব্রুয়ারি ও বৈশাখী ফসলের জন্য এপ্রিল মাসে কুলগাছ ছাঁটাইয়ের কাজ শেষ করেছে। বাগান থেকে এখন শুরু করেছে রঙ্গিনী পোকা থেকে লাক্ষা উৎপাদনের কাজ। এ ৪ হাজার কুলগাছ থেকে প্রতিবছর ৪ হাজার কেজি লাক্ষা উৎপাদন হবে।

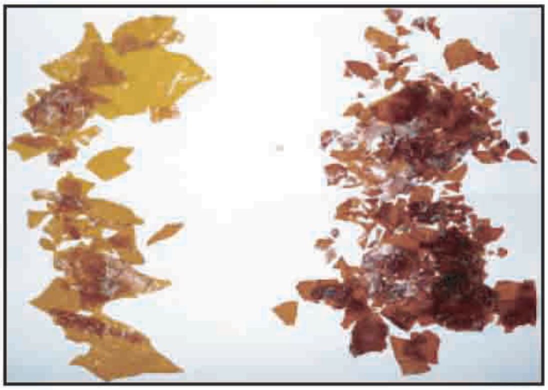

সামাজিক বন বিভাগের কর্মকর্তারা নিয়মিত এসব বাগান পরিদর্শন করেন ও উপকারভোগীদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ লাক্ষা পোষক কুল বাগান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি এ অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানান রাজশাহী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। সব অনাবাদি ও পতিত জমি লাক্ষা চাষের আওতায় এনে দেশের চাহিদা মিটিয়ে লাক্ষা রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক প্রান্তিক ও ভূমিহীন হাজার হাজার কৃষক বা উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান করাও সম্ভব।

লাক্ষা শিল্পের ভবিষ্যত

লাক্ষা এবং ল্যাক ছোপানো হয়েছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য গত কয়েক শতাব্দী ধরে দেশ বং এখনও একটি সম্পূর্ণ সিন্থেটিক হয় না শেলাক জন্য বিকল্প পাশাপাশি, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বিপদ দ্বারা নির্মিত সিন্থেটিক রজন, রং এবং তাদের শিল্প, শক্তিশালী আশা আছে যে বহুমুখী ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ ল্যাক পণ্য তাদের ফিরে পেতে হবে অতীতের গৌরব লক এবং তার এর বৃদ্ধি শিল্প অর্থনৈতিক বজায় থাকবে আমাদের দেশের বিশেষ করে উন্নয়ন উপজাতীয় এবং লক এর দুর্বল অংশের উৎপাদন অঞ্চল উৎপাদন এবং সরবরাহ গুণমানের ল্যাক ভবিষ্যতে পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে বিশ্ব চাহিদা এবং বিদেশী উপার্জন করতে পারে বিনিময়।

লাক্ষা চাষেই লাখপতি গোদাগাড়ীর হামিদ।

গোদাগাড়ীর হামিদ। একসময়ের লাক্ষা বাগানের শ্রমিক, স্বপ্ন দেখতেন, 'একদিন হব লাক্ষাচাষি'। স্বপ্ন মাথায় নিয়ে বরেন্দ্র এলাকার উঁচু-নিচু এলাকায় খুঁজতে থাকেন বন্য-কুল গাছ। অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকা গাছগুলোকে নামমাত্র মূল্যে লিজ নিয়ে শুরু হয় হামিদের লাক্ষা চাষ। কয়েক বছরের মধ্যেই সফল লাক্ষাচাষি হামিদ। এখন গাছের সংখ্যা প্রায় এক হাজার আর আয়! বছরে লাখ টাকারও বেশি। প্রাচীনকাল থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের চারটি গৌরব আম-কাঁসা, রেশম-লাক্ষা। এখন আবার সেই লাক্ষার সোনালি দিন সামনে। গৌরবের লাক্ষা নানা প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতার কারণে ব্যবসায়িকভাবে মার খেলেও আবার রমরমা হয়ে উঠছে লাক্ষা পল্লীগুলো। সম্প্রসারিত হচ্ছে

নতুন নতুন এলাকা। লাক্ষা আমদানিকে সরকারিভাবে উৎসাহিত করা হলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৩৫০টি পরিবার লাক্ষা চাষ করে কয়েক বছরে লাখপতি হতে পারবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ভালো আবহাওয়ার পাশাপাশি বাজার দর ভালো পাওয়ায় চাষিরাও তেমনটাই আশা করছেন। প্রাচীনকাল থেকে লাক্ষা চাষের সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর, দাদনচক, কানসাট এলাকা। লাক্ষা চাষের ব্যাপকতার কারণে একসময় বিনোদপুরকে বলা হতো 'লাক্ষা সোনার বিনোদপুর'।

বিনোদপুরের চাষিদের লাক্ষা চাষ করে বিত্তশালী হওয়াকে নিয়ে এলাকায় নানা কথাও প্রচলিত রয়েছে। চাষিসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, দেশ বিভাগের আগে থেকেই বিনোদপুরসহ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপকভিত্তিক লাক্ষা চাষ হতো। সে সময় দেশের পুরো চাহিদা মেটাত বিনোদপুরের লাক্ষা। মৌসুমে বিনোদপুরের গ্রামগুলো থাকত জমজমাট। আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ লাক্ষা চাষের উপযোগী হওয়ায় ১৯৬১ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের তৎকালীন খামার ইউনিয়নের (বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা) অক্ট্রয় মোড় সংলগ্ন স্থানে ১২.৪৮ হেক্টর জমির ওপর স্থাপন করা হয় 'লাক্ষা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র'। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই কেন্দ্রে ছিল বিভিন্ন জাতের শত শত কুলগাছ। এখান থেকে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট লাক্ষা বীজ সরবরাহ করা হতো চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ দেশের নানা জায়গায়। এর আগে চাষিরা বীজ সংগ্রহ করতেন বিনোদপুর থেকে। লাক্ষা নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রমরমা ভাব কয়েক দশক থেকে পড়তে থাকে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাজারজাতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায়, চাষিদের উৎপাদিত লাক্ষার ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, অবৈধপথে ভারত থেকে লাক্ষার চোরাচালানসহ পুলিশ-বিজিবি কর্তৃক চাষিদের হয়রানির কারণে লাক্ষা চাষে ব্যাপক ধস নামে। এদিকে ১৯৮৫ সালে সরকার অক্ট্রয় মোড়সংলগ্ন স্থানের লাক্ষা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এলাকাটিকে আম গবেষণা কেন্দ্রকে দিয়ে শহরের কল্যাণপুর উদ্যান বেসের পেছনে ১১.০৪ হেক্টর জমির ওপর পৃথক লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করলেও ওই সময় চাষিরা লাক্ষা চাষে এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। স্থলবন্দর দিয়ে এলসির মাধ্যমে লাক্ষা আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দেশের লাক্ষার বাজারটি দখলে চলে যায় ভারতের কাছে। উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন লাক্ষাচাষিরা। ভারতের উৎপাদিত লাক্ষা গুণগত মানের দিক থেকে ভালো না হলেও কম দামের কারণে খুব সহজেই বাজার দখল করে নেয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে দুই হাজার থেকে দুই হাজার ২০০ মেট্রিক টন লাক্ষার চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদার বিপরীতে এখানে উৎপাদন হয় মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ মেট্রিক টন। বাকি সবই আমদানি হয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে। আর দেশে যে ৩০০ থেকে ৪০০ মেট্রিক টন লাক্ষা উৎপাদন হয় তার ৯৮ শতাংশই উৎপাদিত হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর, শিবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর উপজেলার প্রায় ৩৫০ পরিবার এখন লাক্ষা চাষের সঙ্গে জড়িত। বিনোদপুরে চাষির সংখ্যা কমে এলেও বাজার সৃষ্টি হওয়ায় জেলার নাচোল উপজেলায় বেশ সম্প্রসারণ হচ্ছে লাক্ষা চাষের। লাক্ষা চাষ করে চারটি উপকার পাওয়া যায়। গাছের নিচে আদা, হলুদ, গম আবাদ করা যায়, বরই পাওয়া যায়, লাক্ষা ছড়ানোর পর ডালের অংশটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তিনি জানান, চাষিরা রাজশাহীর ভদ্রা, বেলেপুকুর প্রভৃতি এলাকায় নিয়ে গিয়ে লাক্ষা বিক্রি করেন। আবার অনেক সময় লাক্ষা ক্রেতারাই চাষিদের কাছে এসেই লাক্ষা কিনে নিয়ে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের, বিশেষ করে নাচোল উপজেলায় লাক্ষার আবাদ ব্যাপকভিত্তিক হচ্ছে। বছরে দুটি ফসল পাওয়া ও সাথি ফসল হিসেবে গম, হলুদ, কচু, আদা প্রভৃতি আবাদ করার সুযোগের পাশাপাশি বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় চাষিরাও এগিয়ে আসছেন।

উপসংহারঃ

লাক্ষা বাংলাদেশের একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল। সারা দেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে সারা বছরে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে লাক্ষা চাষ হয়। এ পরিমাণ জমি থেকে মাত্র ১৮০ টনের মতো ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে লাক্ষার চাহিদা প্রায় ১২০০ টনের বেশি। বিশ্ব বাজারে লাক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে লাক্ষার বিভিন্নমুখী ব্যবহার এ চাহিদার মূল কারণ। লাক্ষা চাষ সম্প্রসারণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব।

তথ্য সূত্রসমূহঃ

1. Anonymous, Indian Forest Utilization –Vol. II, Forest Research Institute, Dehra Dun, India, 72.
2. N Ferdousee, M J Nayen, A.T.M. R. Hoque M. Mohiuddin. Lac production ant its economic return to rural economy in Rajshahi Division, Bangladesh. Proc. of International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10), Japaon, September 2010. J. Sci. Ind. Res., vol. 27, 1992. pp.69-772.
3. Anonynmous, Insect Dyes. In: Natural colourants and dyestuffs. Non Wood Forest Products . C.L.Green (Ed.). FAO, Rome, Italy, 1995, pp. 63-67.
4. http://info.totthoapa.gov.bd/agriculture